উদ্বাস্তু, নায়কের সন্ধানে ছ'টি উপন্যাস

তাপস ভট্টাচার্য

বুঝিয়াছি আমার স্বদেশ নাই ... পৃথিবীর কোন মাটির কাছে ভিক্ষা চাহিয়াও বাঁচিবার অধিকার পাই নাই। স্বদেশহীন ম
ানুষের স্থান এই মর্ত্যভূমি কি করিয়া হইতে পারে।

দেশ ভাগের অভিশাপ বুকে নিয়ে এই 'স্বদেশহীন মানুষের' দল ভিড় জমালো সেদিনের পশ্চিমবাংলায় নিরাশ্রয়, নিঃসহায়, নির্বান্ধব মানুষের দল। সংখ্যায় প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ। এই বিশাল জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকা স্বাভাবিকভাবেই শিল্প-সাহিত্যের বিষয় হয়ে দাঁড়ালো। লেখা হলো কবিতা-গল্প-উপন্যাস। কিন্তু অধিকাংশ লেখায় আবেগের বাড়াবাড়ি। সংযমের নিদান অভাব। উদ্বাস্তু-জীবনের দারিদ্র ও বেদনা নিয়ে লেখকেরা বিস্তর চোখের জল ফেললেন বটে কিন্তু শিল্প হিসেবে সেগুলি পুরোপুরি ব্যর্থ। অবশ্য এই ব্যর্থতার বাইরেও কিছু লেখা হয়েছে, সংখ্যায় স্বল্প হলেও যেগুলি বাংলা সাহিত্যকে গর্বিত করবে বহুকাল। আমরা কয়েকটি উপন্যাসের কথা বলবো। কিছু নায়কের কথাও। এই উপন্যাসগুলির নায়কেরা তাদের অতীত-বর্তমান, প্রত্যাশা-প্রাপ্তি, স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের জ্বালা নিয়ে আমাদের সামনে হাজির হলো। শুধু হাজির হওয়াই নয়, উপন্যাসগুলিতে এদের উদ্বাস্তু- জীবন যে ভয়ঙ্কর বাস্তবতায় উদঘাটিত হলো তা জীবন সম্পর্কে আমাদের এক নিষ্ক্রা, অম
ানবিক, হিংস্র, নিষ্ঠুর ধারণায় উপনীত করলো। উপন্যাসগুলির উল্লেখ করা যেতে পারে---

ক. সমরেশ বসু-- সুচাঁদের স্বদেশযাত্রা (নায়ক সুচাঁদ)।
খ. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় --- অর্জুন (নায়ক অর্জুন), আত্মপ্রকাশ --- (নায়ক সুনীল)।
গ. শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় --- জাল (নায়ক সতীশ মাস্টার), মাধব ও তার পারিপার্শ্বিক (নায়ক মাধব)।
ঘ. অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় --- নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে (নায়ক সোনা)।
আমাদের প্রথম নায়ক সুচাঁদ। সুচাঁদের জীবনে-চরিত্রে বিশেষত্ব কিছুই নেই। সে বৃত্তিতে বহুরূপী। তার আশা-আকাঙ্খা খুবই কম। তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দরিদ্র মানুষের মতোই তার টিকে থাকা। এমন নগণ্য লোককেও স্বাধীনতা উদ্বাস্তু করে ছেড়েছে। এখানেই তার অভিমান। রাজনীতি তার কোন কাজেই লাগে না অথচ রাজনীতি তার বাস্তুভূমি কেড়ে নিয়েছে। সুচাঁদ তাই ভালো থাকতে পারে না, এদেশকে মেনে নিতে পারে না। কারণ এদেশে সে ভূমিহীন, স্বদেশহীন এক 'রিফ্যুজি' ম
াত্র। থাকে এক কলোনিতে---
"বিলডিহি (সুচাঁদের গ্রাম) মৌজা যে দেশে সেই পুবের লোকেরা এখানে এলে নাকি কলোনিতে থাকে।"
কলোনির অর্থ কি সুচাঁদ তা জানেনা, 'গ্রাম না, শহর না, জায়গার নাম কলোনি।' আশ্চর্য হয় সে। আর এখানে যারা থ
াকে তারাতো ঠিক মানুষ নয়। সুতরাং মানুষের অধিকার থেকেও তারা বঞ্চিত। এই নির্বাসন ভূমি কি স্বদেশ হতে পারে? আর স্বদেশইতো দিতে পারে মানুষকে আশ্রয়। এদেশে না এলে সুচাঁদই কি কোনদিন উপলব্ধি করতে পারতো--
"চন্দ্র সূর্য তারা, আকাশে ভালো। মীন ভালো জলে। ... সুচাঁদ ভালো বিলডিহিতে।'

এক অপ্রতিরোধ্য নিশ্চেতনায় অত্রান্ত হয় সুচাঁদ। জীবনের প্রতি যাবতীয় আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। শু করে চেতনাশুন্য মনুষ্যেতর এক অদ্ভুত জীবন। শেষ পর্যন্ত এই অভিশপ্ত জীবন থেকে মুক্তি পেতেই সুচাঁদের স্বদেশ যাত্রা। পাসপোর্ট - ভিসার পরোয়া করেনি সে। কিন্তু রাষ্ট্র কি কখনো আইন-ভাঙা সাধারণ মানুষকে ক্ষমা করেছে? সুতরাং গেপ্তার ও কারাগারে বন্দী হওয়ার মধ্যেই সুচাঁদের স্বদেশযাত্রার পরিসমাপ্তি। কিন্তু এই স্বদেশযাত্রার মধ্য দিয়েই এই দরিদ্র, নিঃস্ব বহুরূপী মানুষটী নায়ক হয়ে ওঠে। এই স্বদেশযাত্রার মধ্য দিয়েই মানুষ হিসেবে সে তার প্রতিবাদ রেখে যায়। কার অপরাধে ও কোন্ অপরাধে সে উদ্বাস্তু হতে বাধ্য হয়? কেন তার জন্মভূমি বিদেশ হয়ে যায়? যে সব রাজনীতির কারবারী দেশ শব্দের মানে না বুঝে ভাঙার খেলায় মেতেছিলেন এই মানুষটি তার একক প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে গেল 'দেশ' শব্দের মানে কত বড় হতে পারে।

চিরকালের মতো হারিয়ে যাওয়া স্বদেশের জন্য সমস্ত সফলাতা বিসর্জন দিতে চেয়েও অর্জুন কোনদিনই তার প্রিয় গ্রাম পুরান বাড়ি ফিরে পাবে না। কিন্তু গ্রাম ও দেশভাগের বিনিময়ে সে কি পেয়েছে ?

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে অর্জুনদের গ্রামে আগুন লাগানো হয়। দুর্বৃত্তরা অর্জুনদের বাড়ি পুড়িয়ে ফেলে। তার এগারো দিন আগে অর্জুনের বাবা মারা যান। ওদের কোন পুষ অভিভাবক নেই। পরন্তু গ্রাম থেকে দলে দলে পরিচিত মানুষ চলে যাচ্ছে ওপারে। বাধ্য হয়ে অর্জুনের মা এই সঙ্কটকালে দুই ছেলে নিয়ে ভোরের অন্ধকারে দেশত্যাগ করেন। গ্রাম থেকে এগারো মাইল হেঁটে ওরা আসে মাদারীপুর । আঁড়িয়াল খাঁ নদীর কিনারে বসে চিঁড়ে-চাল দিয়ে হয়বাবার পিণ্ডদান। মাথা ন্যাড়া করার সময় ও সুযোগ হয়নি। এখানে স্টীমারের জন্য প্রতীক্ষায় অপেক্ষমান হাজার হাজার দেশত্যাগী মানুষ। ছত্রিশ ঘন্টা অপেক্ষার পর স্টীমারে জায়গা পাওয়া। তারপর স্টীমারে খুলনা। খুলনা থেকে হাঁটা পথে ভারত-যাত্রা। যাত্রপথে যুবতী মায়ের জন্য অসৎ লোকের খপ্পর থেকে উদ্ধারের আশায় এক অচেনা অপরিচিত পল্লীর নদীর ধারে এক পরিত্যক্ত জীর্ণ বাড়িতে আশ্রয়। এভাবে বিপদের পর বিপদ অতিক্রম করে অবশেষে হরিদাসপুর বর্ডার পেরিয়ে বনগাঁ প্রবেশ---

"সকলের তখন দান আনন্দ। আর আমাদের কেউ মারবে না আমরা পেয়ে গেছি নিরাপদ আশ্রয়।"

বনগাঁ থেকে শেয়ালদা স্টেশনে সাময়িক আশ্রয়। তারপর দমদমের এক বাগানবাড়িতে উদ্বাস্তু - জনতা স্থান পেল। স্থান পেল অর্জুনদের পরিবার। যারা দেশ ছেড়ে এসেছে তারাই উদ্বাস্তু পল্লীর নাম দিল 'দেশ প্রাণ কলোনি'। এভাবেই স্বাধীনতা আসে অর্জুনের জীবনে। শু হয় দ্বিতীয় জন্ম । বিধবা মা, উন্মাদ দাদার দায়িত্ব নিতে হয় কৈশোর শু করা অর্জুনকে। হোটেলের বয় দিয়ে শু। স্বাধীনতার স্বাদটা কেমন, শোনা যাক অর্জুনের জীবনীতে--

"আমি প্রথম মাস কয়েক নাগের বাজারে একটা চায়ের দোকানে বয়ের কাজ করেছিলাম। বকশিশ-টকশিশ মিলিয়ে গোটা পঁচিশেক টাকা হতো, আর এক বেলার খাবার। কোন কোন দিন উদ্বৃত্ত মাংসটাংস পেলে বাড়িতে এনে দাদার সঙ্গে ভাগ করে খেতাম।"

এই দারিদ্র সব কিছু কেড়ে নিলেও অজুনের মেধা নষ্ট করতে পারেনি। মেধা দিয়েই অর্জুন জয় করেছিল উদ্বাস্তু-জীবনের দারিদ্র এবং অসম্মান। কিন্তু মন মানে কই ? নিজের গ্রাম ও দেশের বিনিময়ে সেতো এসব চায়নি। সব কিছুর মধ্যেও সে চেয়েছে তার গ্রামে ফিরে যেতে, তার বদলে সবই মূল্যহীন, গুত্বহীন---

"আমার নাম অর্জুন রায়চৌধুরী ... এক পাশে পাটক্ষেত, এক পাশে ধান ক্ষেত, মাঝখান দিয়ে উঁচু রাস্তা, বটতলার একপাশে শ্মশান, আমার বাবাকে ওখানে পুড়িয়েছিলাম, সেই গ্রাম্য ছবিখানি একটুও মলিন হয়নি, জ্বলজ্বল করছে স্মৃতিতে ... দাদ, আমি কথা দিচ্ছি আমি আবার ফিরে যাবো। গিয়ে বলবো যুদ্ধ-বিগ্রহ চাইনা, পাঁচ বিঘেও চাইনা-- আমাদের মাত্র পঁ

াচ কাঠা জমি আর সেই ভাঙা কুঁড়ে ঘরটা ফিরিয়ে দাও।''
কিন্তু কার কাছে চাইবে সেই হারানো ভূমির অধিকার। কে দেবে? সুদুর ভবিষ্যতের গর্ভেও এর উত্তর নেই। নির্বাসিত জীবনে তাই শুধু মনে হয়---

''দেশ ভাগ হবার ফলে অনেকে অনেক কিছু হারিয়েছে ... আমি হারিয়েছি, আমার ছেলেবেলার লাল-নীল-রূপালী স্বপ্ন। পুকুর ধারে, বাঁশ বাগানে, বেতের ঝোঁপের পাশে - যেখানে যেখানে আমি একলা একলা আমার মাউথ অর্গান বাজাতাম সেই সব জায়গায় গাছপালা পরে দেখেছে আমার থেকে ফুঁপিয়ে -ওঠা বুকচাপা কান্না।''

কিন্তু এই বেদনার মধ্যেও অর্জুনকে প্রতিরোধের রক্তাক্ত পথে এসে দাঁড়াতে হয়। এক জবরদখল কলোনিতে(এ সবকলো নিতে উদ্বাস্তুদের জমির মালিকানা নেই) আশ্রয় পেয়েছিল ওরা। সেই 'দেশ কলোনি' ব্যবসার স্বার্থে কেওয়লসিং কয়েকটি উদ্বাস্তু - পরিবারকে উৎখাত করতে চায়। এর বিদ্ধে উদ্বাস্তু-জনতা অর্জুনের নেতৃত্বে বাসভূমি রক্ষার জন্য সঙঘর্ষে লিপ্ত হয় আহত হয় অর্জুন। কিন্তু অর্জুন ভয় পায়নি---
''এই দুবার ওরা আমাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছিল। কিছুতেই পারবে না। কোনদিন পারবে না। আমি বেঁচে থাকবো। আমি ঠিক বেঁচে থাকবো।''

হৃদয়ের আধখানা ফিরে পেতে চায় হারানো স্বদেশ। বাকি আধখানা নতুনভাবে বেঁচে থাকতে চায় অবশিষ্ট যেটুকু টিঁকে আছে তা নিয়ে এদেশে। দেশভাগ শুধু মানুষে মানুষে বিভেদেই সৃষ্টি করেনি, মানুষের এক হৃদয়কেও দু'টুকরো করে দিয়েছে। এই ভাঙা হৃদয়কে আমৃত্যু বহন করবে অর্জুন। বাংলা উপন্যাসে এই ধরণের নায়ক এর আগে দেখা গেছে কি ? কিংবা সমস্ত বোধ ও অনুভব হারানো সুনীলের (আত্মপ্রকাশ) মতো চরিত্র। দেশভাগের ফলে সুনীলকে হারাতে হয়েছে শৈশবের ধাত্রীভূমিকে। যে দেশনেতাদের নিষ্ঠুরতা তাকে দেশত্যাগে বাধ্য করেছে সেই নিষ্ঠুরতার কাছে তার বেদনা মূল্যহীন। মূল্যহীন সুনীল তাই ক্রোধ-ক্ষোভ-অভিমানে রাষ্ট্রের তৈরি সমস্ত ন্যায়-নীতি, ধর্মা ধর্ম বিসর্জন দিয়েছে।তাকে দেখা গেল বেশ্যার দলে, হিজড়েদের নাচে, জুয়ার আসরে, চণ্ডুর আড্ডায়। এছাড়া নারীসঙ্গ ও মদ্যাসক্তির মধ্য দিয়ে উদ্বাস্তু সুনীল শহর কোলকাতায় আত্মপ্রকাশ করেছে। এই মূল্যবোধবর্জিত উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনের কারণ হিসেবে সুনীল দেশভাগের বেদনা ও ছিন্নমূল জীবনের রিক্ততাকে নির্দেশ করেছে---

''আমি নিজের জন্য একটা যুক্তি তৈরি করে নিয়েছিলুম। বাড়ি ঘর ছেড়ে এসে নিজেকে একলা বোধ হতো। তখন আরো মনে পড়তো, আমি শুধু বাড়ি-ঘর বা বাবা-মাকেই ছেড়ে আসিনি, আমি আরো কিছু ছেড়েছি। যে জায়গায় আমি জন্মেছিলাম, তাও আমাকে ছেড়ে আসতে হয়েছে...সে সব হারাবার দুঃখেই আমি যেন একেবারে নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিলাম। অনেক কিছু হারাতে হারাতে মানুষ এমন একটা জায়গায় আসে, যখন তাকে হারাবার নেশায় পেয়ে বসে।''
এক বুক অভিমান মানুষকে শুধুই কাঁদায় না তাকে ক্রুদ্ধ ও হিংস্র করে তোলে। তখন সে প্রতিবাদ করে, প্রতিশোধ নিতে চায়। কিন্তু দেশভাগের সফল কারিগরদের বিদ্ধে সর্বস্ব হারানো এক উদ্বাস্তু যুবক কিভাবে প্রতিবাদ করবে? প্রতিশোধই বা নেবে কি করে? এই অক্ষমতা তাকে ঘৃণা করতে শেখায়। ঘৃণা মানুষকে, মানুষের তৈরি সমস্ত আইন-কানুন, মূল্যবোধকে। এই ঘৃণাই তাকে হিংস্র করে তোলে জীবন সম্পর্কে, জীবনের সমস্ত সুস্থতা সম্পর্কে। সুনীলের ভাবনায় তাই দেখতে পাই---
''তখনো পদ্মার গর্জন, আড়িয়েল খাঁ নদীর ভয়ঙ্কর বান ... বাস্তু ভূমি ছেড়ে আসার অভিমান আমার মধ্যে পুরোপুরি ছিল। মানুষ দেখলে প্রথমেই আত্মরক্ষার জন্য শরীরকে সতর্ক করে নিতুম।''
জীবনে অনেক কিছু হারিয়ে জীবনের মানে নিজের মতো করে বুঝে নিতে চেয়েছে সুনীল। এই 'বুঝে নেওয়া' চরিত্রর এই বিকৃতির তাৎপর্য লক্ষ্য করেছেন মনস্ক সমালোচকও---

''দেশ বিভাগের পরে যারা কৈশোর ডিঙিয়েছে, স্বাধীনতার পর যারা জন্মেছে, তারা কেউই পূর্বতন বাঙলা উপন্যাসের ন

ায়কচরিত্র অধিগত করতে পারে না। স্বপ্ন রচনা করার ক্ষমতা তাদের নেই। স্বপ্ন উপভোগ করার সময় তাদের নেই। তারা জন্মেছে ভাঙা স্বপ্নের হাটে, তাদের চারপাশে বহু ভগ্নমুর্তির জঞ্জাল।"
ভাঙা স্বপ্নের হাটে সুনীল তাই জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে শু করে। সুনীলের ন্যায়-অন্যায় বিসর্জন দেওয়ার মধ্যে যে অপ্রাপ্তি কত যে কান্না লুকিয়ে আছে তা বুঝতে আমাদের অসুবিধে হয় না।

"চিরজীবনের জন্য একটা নদী বা একটা প্রান্তরকে হারাবার দুঃখও কম নয়।" মনে হয়েছে সুনীলের। কিন্তু এই হারানোর মধ্যেও এক তীব্র স্বপ্ন বুকে নিয়ে বেঁচে থাকতে চেয়েছে কোন প্রবল প্রাণ। দেশহারা সতীশ মাস্টার নতুন দেশে প্রিয় জন্মভূমিকে কি গভীরভাবেই না পেতে চেয়েছেন। কলকাতার বুকে একটুকরো বালিখাড়া গ্রাম তৈরি করবেন। এই তার পণ। দীর্ঘদিনের সাধনার পর কোলকাতার বুকে স্বগৃহে তিনি নির্মাণ করলেন ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের এক অখ্যাত বা লিখাড়া গ্রামের মডেল। গ্রামের ফেলে আসা বড়ির আদলে তিনি কেলকাতায় বাড়ি করলেন।সাড়ে তিন বিঘে জমির বা ড়িতে আম, কাঁঠাল, সুপারি গাছ, পগরা, গোয়ালঘর। অবিকল দেশের প্রথা পর্যন্ত তিনি ত্যাগ করেন নি। কাঠের জ্বালে রান্নার ব্যবস্থা। দেশে যেমন ছিল। ছাত্র মানুকে সতীশ মাস্টার বলেছেন---
"কে বলবে যে এই বালিখাড়ার সেই পগার নয়? সেই কচুবন, বড়ই (কুল) গাছ, করমচা এভরিথিং। মাঝে মাজে এযে কে ালকাতা শহর তা আমারই মনে হয়ে না।"

ঘটনাচক্রে এক কোপমানির হাইরাইজ অ্যাপার্টমেন্ট করার জন্য সতীশ মাস্টারের সাড়ে তিন বিঘে জমির প্রয়োজন হয়। তঁ াকে পাঁচ লাখ টাকার প্রস্তাব দেওয়া হয়। দরিদ্র স্কুল শিক্ষক তা প্রত্যাখ্যান করেন। বিরল তাঁর সেন্টিমেন্ট, অনমনীয় তাঁর জেদ। ফলে এক ছদ্মমস্তানের হাতে তার মৃত্যু হয়। কিন্তু স্বরচিত বিক্রমপুর থেকে জ্যান্ত অবস্থায় এক চুলও নড়েননি তিনি। বিক্রমপুরের সেই গাঁয়ে 'শকুনের ছায়া' সতীশ মাস্টার সহ্য করতে পারেন নি।

আপাতদৃষ্টিতে সতীশ মাস্টারের চরিত্র একটু রহস্যময় বলে মনে হয়। কিন্তু আমাদের মনে হয়েছে সতীশ মাস্টার প্রতীক চরিত্র। ছিন্নমূল মানুষ এদেশে এসেও ফিরে পেতে চেয়েছে সেই সব গ্রাম, সেই পরিবেশ, সেই সব মানুষ--- যাদের নিয়ে যুগ যুগ ধরে পুষানুক্রমে বেঁচে থাকা। কল্পনায় ছিন্নমূল মানুষ তাই বুকে ধরে রাখে প্রিয় জন্মভূমি। এদেশকে কখনো মন থেকে মেনে নিতে পারে না। ক্ষ নির্বান্ধব আন্তরিকতা শূন্য এই দেশকে প্রবাস বলেই মনে করেছে বাস্তুহীন মানুষ। তাই কে ালকাতা নয়, কর্মস্থল নয়, উৎখাত হওয়া গ্রামের প্রতিই সতীশ মাস্টারের সতীর সংরাগ---
"আমাদের ফার্স্ট সেন্টিমেন্ট ছিল নিজের গ্রাম। তারপর জেলা। তারপর প্রদেশ। তারপর দেশ। বালিখাড়ার প্রতি যেমন ফিলিং ইন্ডিয়ার প্রতিও তাই।"

কিন্তু সেই গ্রাম এখন বিদেশ, সেই দেশ এখন খন্ডিত। সতীশ মাস্টার নির্বাসনে স্বরূপের সন্ধান করেছেন। ইট - কাঠতৈরি শহরের ক্ষতায় শ্যাম-স্নিগ্ধ বালিখাড়া গ্রামের অস্তিত্বকে অনুভব করতে চেয়েছেন। বঙ্কিম থেকে আজ পর্যন্ত বাঙলা উপন্য াস সাহিত্যে নায়ক সংখ্যা কম নয়। তাদের জীবন ও সমস্যা, স্বপ্ন ও স্বপ্ন ভঙ্গের বেচিত্র্যও কম দেখিনি। কিন্তু সতীশ মাস্ট ারের মতো এমন স্বপ্ন দেখা নায়ককে এর আগে পেয়েছি ? নিশ্চিতভাবেই বলা যায় পাইনি।

শুধু স্বপ্ন দেখা নায়ক নয়, উদ্বাস্তু-শিশুর চরিত্র রচনাতেও (মাধব ও তার পারিপার্শ্বিক) শীর্ষেন্দু আমাদের বিস্মিত করে দেন। এই উপন্যাসের নায়ক মাধবের-শৈশব ও কৈশোরের সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে। দেশ বিভাগের পরিপ্রেক্ষিতে মাধবে বেঁচে থাকা ও তার মানসিক চিন্তাভাবনাকে লেখক তুলে ধরেছেন।

জীবনে কোনকিছুই পায়নি মাধব অথচ হারিয়েছে প্রায় সবকিছু। পূর্বপুষের ভিড়ে (ঢাকার বজ্রযোগিনী গ্রাম, বিষয়-স ম্পত্তি, সুস্থ জীবন। বর্ধমান এসে মাধবের স্থায়ী উদ্বাস্তু জীবন (বেশ কিছুদিন এখানে ওখানে ঘুরতে হয়েছে) শুহয়। মাধব

বুঝতে শেখে ওরা উদ্বাস্তু, ওরা অসহায়, ওরা দীন-দরিদ্র। স্থানীয় মানুষ ওদের আদৌ মানুষ ভাবতে পারেনি। বিদ্রুপ করেচে মাধবকে---

ক. "বাঙাল নাকি তুই ?
মাধব মাথা নাড়ল ! হ্যাঁ, তারা বাঙাল
বুড়ি বললো, বাববা ! কি ভাষা হাই মাউ খাঁও।"
খ. "বাঙালদের বাড়ির ছেলে (মাধব)? হুঁ তোদের কি আর জাতধর্ম আছে রে ! বামুন কায়েত বাগদী সব একাকার।"

এতো অপমানের মধ্যেই স্থানীয় এম এল এ কেশববাবুর সুন্দর ছেলেটাকে দেখে এক অপ্রতিরোধ্য হীনমন্যতায় আক্রান্ত হয় মাধব। কেশববাবুর মেয়ে চিমটির গানে গায়ের গন্ধেটের পায় অচেনা ও অন্য এক পৃথিবীর ঘ্রাণ যেখানে সে যেতে পারবে না কোনদিন। উন্মাদ পিতার মৃত্যুর পর হিস্টিরিয়া রোগগ্রস্ত পিসী ছাড়া এ পৃথীবীতে তার কেউ নেই--মাধব জানে তার কোথাও যাওয়ার নেই। কোথাও ফেরার নেই। এবং এই বিশাল পৃথিবীতে মাধম এভাবেই বড় হবে, বেঁচে থাকবে। দেশভাগ না হলে, উদ্বাস্তু না হলে তার জীবন নিশ্চয় অন্যভাবে অন্যখাতে, বইত। কিন্তু উদ্বাস্তু জীবনের অভিশাপ তাকে বাস্তবের কঠিন মাটিতে আছড়ে ফেলেছে। এমন এক অবাঞ্ছিত জীবন যা সে চায়না অথচ তাকে দেওয়া হয়েছে --- এই জীবনকেই মাধব বহন করবে আমৃত্যুকাল।

সুচাঁদের মতো জীবন সম্পর্কে সমস্ত আগ্রহ হারিয়ে ফেলা নয়, নয় অর্জুনের মতো একই সঙ্গে স্মৃতিপ্রবণ ও সংগ্রামী। স্বপ্ন দেখা সতীশ মাস্টার কিংবা স্বপ্ন দেখতে ভুলে যাওয়া সুনীল অথবা উচ্ছিষ্টের মতো কোনমতে বেড়ে ওঠা মাধবও নয়। উদ্বাস্তু হলেও সে সবার থেকে আলাদা। সে সোনা। 'নীল কণ্ঠ পাখির খোঁজে'র হতভাগ্য নায়ক। ও দেশে সচ্ছল কিন্তু এদেশে এসে ধীরে ধীরে দরিদ্র হয়ে যাওয়া সোনা। দেশে ওদের অর্থ-মান-সম্মান-প্রতিপত্তি সবই ছিল। এদেশে সোনাদের সেই অবস্থা আর নেই। তার এখন রিক্ত, নিঃস্ব, মৃতপ্রায় মানুষ। এদেশে এসে সোনা তার বাবার মুখে হাসি দেখেনি, মাকে দেখেটের পায় দারিদ্র্য এবং দুশ্চিন্তা তাকে কতটা বিবর্ণ করে তুলেছে। সঞ্চিত যা কিছু ছিল দেশতাগের তিন বছরের মধ্যে শেষ। এখন আছে তিনটে কুঁড়ে ঘর আর কিছু অন্নহীন প্রাণ। পরিবারের এই অবস্থায় সোনার কিছুই ভালো লাগে না। মন বিষণ্ণ হয়ে ওঠে---

"জেঠিমার এই মুখ দেখলে সোনা চোখের জল রাখতে পারে না। মা না খেয়ে শীতের কাঁথায় শুয়ে থাকলে তার পড়াশুনা করতে ভালো লাগে না ... অন্নহীন এই সংসারে সোনার নিজেকে বাড়তি লোক মনে হয়।"

কিন্তু কেন এই রক্তক্ষরণ, কেন এই হাহাকার? দেশভাগের সময়তো ওদের বলা হয়েছিল এদেশে ওরা সম্মানিত অতিথি, কেননা ওদের আত্মত্যাগে দেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তি। সোনাও তাই ভেবেছিল---
"... এ দেশে এসেই ওরা সবাই রাজার মতো রয়ে যাবে। কত সমারোহ থাকবে জীবনে। দেশভাগের নিমিত্ত ওরা শহিদ হয়ে গেছে--- সুতরাং সর্বত্র ওদের জন্য বিজয়পতাকা উড়বে।"

এই তীব্র দারিদ্র থেকে মুক্তির জন্যই সোনাকে জাহাজের চাকরি নিয়ে বাঙলাদেশ ছেড়ে চলে যেতে হয়। চাকরি নেবার আগে সোনার কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, ও বিফ খায় কিনা? এক আজন্ম সংস্কার সোনাকে নির্বাক করে দেয় । কিন্তু যখন বুঝতে পারলো জাহাজের চাররি পেতে হলে বিফ খেতেই হবে তখন সোনা সমস্ত সংস্কার ছুঁড়ে ফেললো. জীবনের চরমতম দুরূহ সিদ্ধান্ত নিল সোনা--- "মা তার অন্নহীন। ভাইবোনের শুকনো চোখমুখ ভেসে উঠলো। সে বললো, আমি পারবো স্যর। সে বলতে বলতে মাথা নিচু করে ফেললো।" যে ধর্ম রক্ষার জন্য তাদের উদ্বাস্তু হতে হয়েছে, এদেশে শুধু বেঁচে থাকার তাগিদে সেই ধর্মের নিষিদ্ধ খাদ্য গ্রহণে সোনাকে সম্মতি দিতে হয়েছে। প্রাকর্তা সেই সেকেণ্ড অফিসার পর্যন্ত টের পেয়েছিলেন--- "ছেলেটি (সোনা) ওর সামনে দাঁড়িয়ে মাথা নিচু করে, এই প্রথম এত যন্ত্রণার পর কাঁদছে।"

অবশেষে জাহাজে চাকরি। কোন ভূমির (ওদেশ-এদেশ) কাছেই সেই আশ্রয় ও বেঁচে থাকার রসদ পায়নি। তাই মাটি নয়। জলেই সে আশ্রয় নিয়েছে। স্বদেশ এবং এদেশ দুই ভূমিকেই ত্যাগ করে সোনা ভেসে যেতে চেয়েছে অকূল দরিয়ায়। এই যাত্রার মধ্যে দিয়েই বাঙলা উপন্যাসের ভূগোলকে প্রসারিত করেছে সোনা।

উদ্বাস্তু জীবনাশ্রিত বাঙলা উপন্যাসের সংখ্যা কম নয়। অধিকাংশ উপন্যাস অবশ্য সাধারণ স্তরের। লেখকদের অভিজ্ঞতার অভাব এবং প্রতিভার দৈন্য এর কারণ বলে মনে হয়। আর একটি কারণ, বাঙালি লেখকদের সময় ও সমাজসম্পর্কে শীতল ঔদাসীন্য। এই ঘাটতি তাঁরা দূর করতে চেয়েছেন বৈচিত্র দিয়ে। অথচ--"পঞ্চাশ লক্ষ লোক ঘর-বাড়ি-সমাজ-সংসার ছেড়ে চলে এলো। দশ পনের বছর ধরে স্রোতের জলে ভেসে ভেসে বেড়াল শিকড় গাড়ল না কোথাও ... আজকের সাহিত্যিকের দৃষ্টি পড়ল না ওদের দিকে। বাঙলাদেশের সাহিত্যিক বৈচিত্র্যের খোঁজ করেছেনইতিহাসের পাতায়-পুরানো কোলকাতার নথিপত্র সিপাহী বিদ্রোহের ইতিবৃত্তে ; লেখবার বিষয়বস্তুর সন্ধানে তাঁরাদেশছাড়া হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন নাগা হিল্‌সে, সিন্ধু পারে। জীবনের রহস্যের সন্ধানে আড়ি পেতেছেনশ্মশানের বামাচারে।"

এই অভিযোগ একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায়না। পাশাপাশি এ কথাও বলেতে হবে কোন কোন লেখক উদ্বাস্তু জনতা ও জনজীবনকে উপন্যাসে ব্যবহার করেছেন সামাজিক কর্তব্য ও শিল্পীর দায়িত্ব পালন করতে। প্রতিভা তাঁদের ছিল না এমন কথাও বলা চলে না। আলোচিত ছটি উপন্যাস থেকে তা বুঝে নিতে আমাদের অসুবিধে হয় না। এই উপন্যাস ছ'টি এবং নায়ক চরিত্রগুলি আমাদের স্বস্তি কেড়ে নেয়, উপন্যাস পাঠের স্বাভাবিক তৃপ্তি হরণ করে ফেলে। চরিত্রগুলি আমাদের ভাবায়, রাগায়, প্রশ্ন করে চলে।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com